তৃতীয় মাত্রা

পর্ব- ৬৫৪৯

উপস্থাপনা- জিল্লুর রহমান

আলোচক- আজকের অতিথি আইইডিসিআর-এর সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. মুশতাক হোসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিললাল হোসেন।

তারিখ- ০৭-০৭-২০২১

জিল্লুর রহমানঃ দর্শক প্রতিদিনই কোভিড পরিস্থিতি দেশের খারাপের দিকে যাচ্ছে। উদ্বেগজনক ভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অনেকের ধারণা। কোন না কোনো রেকর্ড হচ্ছে প্রতিদিন, কোনদিন মৃতের রেকর্ড কোনদিন আক্রান্তের রেকর্ড মাধ্যমিক পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের রেকর্ড। অনেকেই ধারণা করছিলেন বাংলাদেশের বিশেষ করে যারা গ্রামে গঞ্জে থাকেন যে এটা শহুরে মানুষের রোগ কিংবা দরিদ্র মানুষ খাওয়া মানুষ শ্রমজীবী মানুষ খেটে মনে করতেন এটা ধনীদের রোগ বা বিত্তবানদের রোগ। কিন্তু এখন যে পরিস্থিতি তাতে এটা সবার রোগ, ধনী-দরিদ্র বা বিত্তশালী বিত্তহীন কিংবা মধ্যবিত্তবর্ণ গোত্র কোন কিছুই মানছে না কোভিড এবং এই ছোট্ট অনুজীব যেভাবে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে চিত্র টা এরকম একজন তিনটি পার্বত্য জেলা বাদ দিলে ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৬১ টি জেলায় গত ১০ দিনে কেউ না কেউ মারা গেছেন এবং ঢাকাবাসির অনেকেই মনে করেছিলেন যে কত বছরের চাইতে এবছর ঢাকার পরিস্থিতি মোটামুটি ভাবে বেশ ভালো এবং সে ধারনাও একেবারে ঠিক নয় কারণ গত ১০ দিনে বা ১১ দিনে হিসেবে যেটি দেখা গেছে সেটি হচ্ছে যে মৃতের সংখ্যা টা ঢাকায়ই সবচাইতে বেশি,মানুষ মারা যাচ্ছে ঢাকায় সবচাইতে বেশি। সব মিলিয়ে আসলে কোভিড পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে ,ভ্যাকসিন নিয়ে এখনো পর্যন্ত অনিশ্চয়তা রয়েছে যদিও কিছু কিছু ভ্যাকসিন আসতে শুরু করেছে কিন্তু আমাদের চাহিদার অনুপাতে এটি খুব সামান্য। এই ভ্যাকসিন কবে নাগাদ আসবে,আমরা মাস্ক এর কথা বলছি এটি প্রাথমিক ভ্যাকসিন হিসেবে কিন্তু শহরে যখন আমরা ঘোরাঘুরি করি শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ যদি মানুষ মাস্ক পরে থাকেন তারমধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষকেই দেখা যায় যে মাস্কটা থুতনি এর মধ্যেই থাকে অর্থাৎ নাক মুখ ঢাকেন না তারা এবং স্বাস্থ্যবিধির অন্যান্য দিক ও যে তারা মেনে চলছেন তাও বলা যায় না। কেন মানছেন না সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। লকডাউন চলছে এবং এই লকডাউন কে অনেকেই মনে করছেন এখন ঢিলেঢালা ভাবে আর ও এক সপ্তাহ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এই এক সপ্তাহ পরে সামনে আছে ঈদ কি ধরনের পরিস্থিতি বাংলাদেশ মোকাবেলা করবে সেটি নিয়ে অনেকের মাঝে উদ্বেগ আছে কিন্তু অনেকেই আবার লকডাউনটা তুলে দেবার চাপ সৃষ্টি করছেন। এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে আজকে ঢাকার ধানমন্ডি থেকে যুক্ত হচ্ছেন রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ গগবেষণা ইন্সটিটিউশনের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা যেটাকে আমরা আইইডিসিআর বলি তার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. মুশতাক হোসেন এবং আমাদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে যুক্ত হচ্ছেন পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিললাল হোসেন। স্বাগতা আপনাদের দু'জনকেই তৃতীয় মাত্রায়, প্রফেসর ডঃমোহাম্মদ বিললাল হোসেন আপনাকে বিশেষভাবে স্বাগতম তৃতীয় মাত্রায়। ডা. মুশতাক হোসেন আপনাকে দিয়ে আলোচনাটি শুরু করতে চাই যে পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে কি মনে হচ্ছে যে কতটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে বা কতটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে আপনাকে এই প্রশ্নটা করতে চাই যে আমরা প্রতিদিন যে হিসাব নিকাশ পাচ্ছি সেটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য বা পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশেষ করে পরীক্ষা হচ্ছে কিনা এটি নিয়ে অনেকের মধ্যে সংশয় রয়েছে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই ডা. মুশতাক হোসেন।

ডা. মুশতাক হোসেনঃ জি ধন্যবাদ,বাংলাদেশের একটা জরুরী গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে উদ্বিগ্ন মুহূর্তে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যেএবং সেইসঙ্গে আমি সহসমালোচক ড. মোহাম্মদ বিললাল কে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সংক্রমণ পরিস্থিতি এখন শীর্ষবিন্দুর দিকে যাচ্ছে। যাকে ইংরেজিতে পিক টাইম বলে। আমাদের এখানে শুরুতে সংক্রমণ শুরু হয়েছিল ঈদের পরে সেটি ধীরে ধীরে বারছিল এবং শেষ সময়ে সরকার সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না নেওয়া হলে ওই সময়ই এই অবস্থা হতে পারত| সংক্রমণ ধীরে ধীরে ছড়িয়েছে, সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে প্রথম যখন লকডাউন করা হলো কিন্তু পাশের জেলা কিছুই করা হয়নি। ফলে অতিরিক্ত উচ্চ সংক্রমণশীল জেলা থেকে পাশে কম সংক্রমণে জেলা কিন্তু যাতায়তটা বন্ধ করা এটা খুবই কঠিন। মানুষ গ্রাম থেকে গ্রামে হেঁটে গিয়েছে বা অযান্ত্রিক যানবাহনে গিয়েছে। কিন্তু বড় বড় সড়কগুলো বন্ধ ছিল। এভাবে চলাচল ছিল চাপাইনবাবগঞ্জে আমের সেই বিষয় কে নিয়ে দেখার বিষয় আছে। যেমন করে সামনে কোরবানির হাট সীমিত আকারে হলেও সরকার সেটি খুলে দিতে হচ্ছে। কারণ তান্ত্রিক মানুষ সারা বছর গরু-ছাগল লালন-পালন করেন কোরবানির হাটে বিক্রি করার জন্য। তো আমাদের দেশী পাল্লা পরিপূর্ণভাবে একটা কল্যাণরাষ্ট্র করতে পারিনি যে প্রত্যেকটা নাগরিকের খাওয়া,পরা, থাকা তাদের সেই ব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রতি টা করা সম্ভব হচ্ছে না। ঈদের লক্ষ আছে। কাজে সেখানে আমাদের কম্প্রোমাইজ করতে হচ্ছে অনেক|যাই হোক সে সংক্রমণটা বাড়তে বাড়তে যখন গোটা দেশেই ছড়িয়ে পড়লো এবং শনাক্তের হার শতকরা ২০ এর উপরে চলে গেলত খনই সারাদেশে এই জনস্বাস্থ্যের বিধি নিষেধ, যেটা লকডাউন নামে পরিচিত, লকডাউন কথাটা আমি পছন্দ করি না একেবারেই। এটা মানুষকে ভীতির সঞ্চার করে। মানুষকে সম্পৃক্ত করেই এই যাতায়াতের বিধি নিষেধ এবং ঘরে থাকার বিষয়টি আমাদের কার্যকরী করতে হবে। আসলে এটাই করার নিয়ম। যাইহোক সেটা বেড়ে গেছে, পহেলা জুলাই থেকে আমরা শুরু করেছি সংক্রমণের যে নিয়ম হলো রোগ তাত্ত্বিকভাবে এই রোগের সুপ্তকাল হচ্ছে দুই সপ্তাহ। এখন যাদের মধ্যে আমরা সংক্রমণ দেখছি ১১ হাজারের বেশি আজকে ধরে নেওয়া যায় রোগতাত্ত্বিক ভাবে তারা ১৪ দিন আগে থেকে সংক্রমিত হচ্ছে। ১৪, ১৩, ১২, ১১ মানে পহেলা জুলাই আগেই হয়তো ভাইরাস এর সংস্পর্শে এসেছে, ভাইরাস টা তাদের দেহে প্রবেশ করেছে তার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে এই ১৪ দিনের ভিতরে। এই পহেলা জুলাই থেকে যে বিধি নিষেধ দেওয়া হয়েছে তার ফলাফল যদি দেখতে হয় আমাদের সংক্রমণ পরিস্থিতি পরে তাহলে জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আগে হয়তো বোঝা না ও যেতে পারে| আর একক দিন পর্যন্ত সংক্রমণ বাড়বেই বিশেষ করে সাত থেকে দশ দিন এর মিউটেশন পিরিয়ড ১৪ দিন কিন্তু সংক্রমণ টা বেশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় শুরু হওয়ার ভাইরাস দেহে ঢোকার ৭ থেকে ১০ দিনের মাথায়। তাহলে এপ্রিলের ৭ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত সংক্রমণ বাড়তেই থাকবে। মৃত্যুর বিষয়টা যাদের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পায়...

জিল্লুর রহমানঃ এপ্রিল না জুলাইয়ে..জুলাইয়ে।

ডা. মুশতাক হোসেনঃ জুলাইয়ের হ্যাঁ.. ৭ থেকে ১০ জুলাইয়ের মধ্যে তাহলে এটি সংক্রমনের শীর্ষবিন্দু হয়তো দেখা যাবে। তারপরেও এটা কন্টিনিউ করতে পারে। তবে আমি আশা করি যে গ্রামেগঞ্জে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার বিষয়ে, গ্রামে স্বাস্থ্য কাঠামোটা কিন্তু ভালো, গ্রামে সামাজিক কাঠামো ভালো| তাদেরকে যদি কাজে লাগানো যায় নিশ্চয়ই সেটা .. এটার বিষয়ে আমি পরে আসছি| তোমৃত্যুর বিষয়টা হচ্ছে যারা যাদের মধ্যে লক্ষণ টা প্রকাশ পেল লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার তিন সপ্তাহের মাথায় গিয়ে| তাদেরকে আইসিওতে যাওয়া বা একটা করুণ পরিণতি খারাপ পরিণতি হতে পারে| তিন সপ্তাহের মাথা যারা মৃত্যুবরণ করেন গড় তথ্য হিসেবে তিন সপ্তাহ মৃত্যুবরণ করেন| পহেলা জুলাইয়ের আগে যাদের লক্ষণ দেখা গিয়েছে, যারা শনাক্ত হয়েছেন তারা এখন মৃত্যুবরণ করছেন| যারা যে পারে প্রকাশ করেছে তাদের জন্য আমাদের ঘনিষ্ঠ জনও অনেকে মারা গেছে| তো পহেলা জুলাই থেকে বিধি-নিষেধ দেওয়া হয়েছে সেটা মৃত্যু ওপরএ প্রভাব ফেলছে কিনা কমে যাচ্ছে কিনা সেটা জুলাইয়ের লাস্টে তৃতীয় সপ্তাহে আমরা বুঝতে পারবো| তবে জুলাই মাসের আড়াই সপ্তাহ পরে অর্থাৎ আপনার ১৪ পরে ১৬, ১৭ তারিখের দিকে মৃত্যুর সংখ্যা টা হয়তো একটু বেশি দেখা যাবে| তার থেকে আস্তে স্থিতিশীল হওয়া শুরু করবে| কাজেই এখনকার যেই বিধি-নিষেধ সেটা কার্যকর হবে তবে গ্রাম অঞ্চলের আমি যেই সুবিধার দিকটি

সেটা বললাম, যে সেখানে জনসাস্থ কাঠামোর কমিউনিটিকে ঝড়ের পরে স্বাস্থ্যকর্মীরা আছে পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরা আছে অনেক এনজিও আছে রেড ক্রিসেন্টের কর্মীরা আছে এদের সবাইকে যে সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা কাজে লাগাচ্ছেন তার কিন্তু ফল পাচ্ছে|

জিল্লুর রহমানঃ তো ডঃ হোসেন গ্রামে তো পরীক্ষাই করাতে পারছেন না কেন গ্রামে তো পরীক্ষার সুবিধা নাই| কারাতে হলে অনেক জেলায় জেলা শহরে যেতে হয় পরীক্ষা করাতে|

ডা. মুশতাক হোসেনঃ হা সেই চ্যালেঞ্জের কথা আসছি| চ্যালেঞ্জ এখানে কয়েকটি আছে| প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো এখানে রাস্তাঘাট নিয়ন্ত্রণ ঢাকা শহরের মধ্যে হয়তো ঘরে ঢাকা শহরের মত রাস্তাঘাটে অলিতে-গলিতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পাওয়া যাবে না, কিন্তু সেখানে যেটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কোন বাজার কিংবা চায়ের দোকান খোলা রাখা যাবে না| ছোট ছোট মোদিরদোকান ঢাকা শহরের খোলা রাখা যেতে পারে বা নিত্যপ্রয়োজনীয় রেডিও টেলিভিশনে এসে খবর দেখবে সেই জামায়াত করা যাবে না| কিছুতেই কোন সামাজিক অনুষ্ঠান করা যাবে না| বিয়ে-শাদী হয়তো রেজিস্ট্রি করার জন্য দুই পরিবারের ৫, ৭ জন তারা হতে পারেএকত্র, কিন্তু কোনভাবেই মাস্ক খুলে একসাথে খাওয়া দাওয়া করা যাবে না| অনুষ্ঠান তো করা একেবারেই করা যাবে না| আরেকটা জায়গা হচ্ছে মসজিদ| এখানে করণা দুর্যোগের সময় মসজিদে অনেক মানুষ যাচ্ছে আগের চাইতে বেশি তারা আল্লাহর কাছে দোয়া চাচ্ছে, এটা মানসিক শক্তি আর ও বাড়িয়ে দেয় এটা অবশ্যই অনস্বীকার্য| কিন্তু মাস্ক ছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মানা ছাড়া এবং অনেক মানুষ যদি মসজিদে প্রতিবার যান, বিশেষ করে জুম্মার সময় সংক্রামন টা হু হু করে বাড়বে| আমি টাঙ্গাইলের একটা গ্রামের কথা জানি, টাঙ্গাইলের গ্রামে কোন হাট-বাজার নেই সেই গ্রামটাই, সেখানে কোন চায়ের দোকান নেই., টেলিভিশন দেখা একত্রে গ্রামবাসীরা বন্ধ করা হয়েছে এমনকি চেয়ারম্যান বামেম্বারের বাড়িতে টেলিভিশন দেখা বন্ধ করা হয়েছে যাতে টেলিভিশন.. সেখানে ভিড় করতো| তার পরেও সংক্রামন কমছে না, এক মাসে ৫ জন মানুষ মারা গিয়েছে করোনা শনাক্ত হয়ে|কেন? সেখানে মসজিদ গুলোতে অনেক ভিড় বেড়ে গেছে| এখানে ধর্মীয় দেরকে অবশ্যই এখানে তাদেরকে বলতে হবে যে নামাজ বাড়িতে পরলেও হবে| এখন মহামারী চলছে মসজিদের ভিড় করার প্রয়োজন নেই এবং মাস্ক নিয়ে যাচ্ছে না, ভুল ধারণা মাস্ক নিয়ে যাচ্ছে না তারা,গায়ে গা লাগিয়ে কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পরছে এটাকেও একটা আমাদের দুর্বলতার কাজ| টেস্টটের বিষয়ে হা..টেস্টটের বিষয়ে কিন্তু এখন এই বছরেকিন্তু আমাদের অ্যান্টিজেন টেস্টের ব্যবস্থা আছে| যে সমস্ত জেলায় হেলথ চেক করা তারা বেশ সক্রিয় তারা কিন্তু একটা অ্যাম্বুলেন্সে করে অ্যান্টিজেনের টেস্ট কিট নিয়ে তারা এই যে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের তারা গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দিতে পারছেন| সেখানে অন দ্যা স্পট পরীক্ষা করে টেস্টের যারা পজেটিভ তাদের রেজাল্ট দেওয়া হচ্ছে| যাদের নেগেটিভ আসছে তাদের নমুনাগুলো আরো ভালো পরীক্ষা করার জন্য আর্টিপিসিআর এর জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে| এটা কিন্তু চাঁপাইনবাবগঞ্জের সেখানকার স্বাস্থ্য বিভাগ প্রশাসন বলেছে আশায়িত করেছে নওগাঁর আন্ডারেও করেছে| এটা অন্যান্য জেলায়ও অনুসরণ করা হচ্ছে, তো সব জায়গায় করা উচিত কাজেই আগের চাইতে অ্যান্টিজেন টেস্ট করার সুবিধা বেড়েছে কিন্তু একটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে এখনো পর্যন্ত একটা ভয় আছে যে টেস্ট করে পজেটিভ হলে প্রশাসন থেকে লাল পতাকা টানিয়ে দেওয়া হবে| এই বাড়িগুলো বন্ধ হয়ে যাবে একটা বিবর্তনমূলক পরিস্থিতি| তাই বলব যে সেই বাড়িগুলো যদি চিহ্নিত করতেই হয় তাহলে রেড ক্রিসেন্ট কিংবা হাসপাতালে কোন একটা সিগন্যাল লাগায়া দিবেন এবং সেটা হবে সহযোগিতামূলক| প্রশাসন থেকে বলবে তোমাদেরকে আমরা চিহ্নিত করছি সহযোগিতা করার জন্য তোমাদেরকে বন্দী করে রাখার জন্য নয়| মানুষকে ভয় ভীতি দেখিয়ে করোনার প্রথম পর্যায়ে হয়তো এটি কাজে দিয়েছে মানুষ ও ভীত সংকোচ ছিল| এখন স্বাভাবিক সাইকোলজির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী তীব্র শোক কিংবা অনেক আনন্দ বেশি দিন স্থায়ী হয় না| মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলে যায়| যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্থান বলেন সিরিয়া বলেন প্যালেস্টাইনের জীবনযাত্রা কি থেমে আছে?বল পড়চে শিশুরা খেলছে এটাই জীবনের ধর্ম| তাহলে আমাদের দেশে সারা বিশ্বে দের বছর হয়ে গেছে করণা সংক্রমণ| মানুষ একজসস্টেট এবং জীবন জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ কিন্তু যুগের সম্পর্কে জানেনা তানা| আমি একটা উদাহরন দিচ্ছি| যদি ঝড়

নামার ক্ষণে একটা খেয়া নৌকার মাঝি জানে নৌকাডুবি হতে পারে| তারপরে তার ঘরে যদি চাল না থাকে স্বেচ্ছায় যদি ঝড়টা দেরিতে আসেআমি খেয়া নৌকাটা পাড়ি দেই কিছু প্যাসেঞ্জারতো পাব| যেসব প্যাসেঞ্জার ডেস্পারেট ওপারে যেতেই হবে তারাও সেই খেয়া নৌকায় উঠে যদি ঝড় টা এসে যায় তারা হয়তো বা কেউ বাঁচে বা কেউ বাঁচে না| কাজেই মানুষ বিপদ জেনেও এই কাজ টা করে তাদের জীবিকার প্রয়োজনে| ঘরে যদি তাদের খাবার না থাকে তাকে ছোট শিশু না খেয়ে আছে কিংবা বয়স্ক বাবা-মা না খেয়ে আছে সেক্ষেত্রে তারা বাধ্য হয়ে বের হয় হচ্ছে| এখানে সামাজিক সহযোগীতা ছাড়া সরকারকে তো দায়িত্ব নিতে হবে কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে পরিপূর্ণ কল্যাণ রাষ্ট্র বাংলাদেশ হয়নি এখনো| সরকারের একার পক্ষে সমস্ত মানুষকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া 14দিন একটা চ্যালেঞ্জ বলে| সেখানে যদি সমাজে সচ্ছল যারা ব্যক্তি তারাএলাকাভিত্তিক এগিয়ে আসে এটা সম্ভব দেখেছি আমরা করোনার সংক্রমনের প্রথম দিনের সময় তারা সেটা সফল ভাবেই করেছেন| এলাকার মানুষ এগিয়ে এসেছিল| ফলে মার্চ এপ্রিল মে মাসে প্রণোদনা সফলভাবে হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে রাজারবাগ এবং ওয়ারিতে যখন জোরালো লকডাউন করা হলো তখনো কিন্তু এলাকার মানুষ তাদেরকে সহায়তা করেছে| কাজে এই শক্তিকে জাগিয়ে তোলবার জন্য সরকার দায়িত্ব আমাদের সামাজিক শক্তি আছে জনপ্রতিনিধি আছে পাড়ার যুবকরা আছে ভাড়াটিয়ারা আছে এদেরকে যদি কাজে লাগানো যায় অবশ্যই আমরা প্রতিরোধ করতে পারবে আর ঢাকা শহরে করোনা সংক্রমণ বাড়বে নিশ্চিতভাবে বলছি আমি কুরবানী ঈদের পর পর| কারণ এখন যে গ্রামে আছে গ্রাম শহর প্রায় সমান হয়ে গেছে|কোরবানির ঈদের সময়..

জিল্লুর রহমানঃ মানে এখন যেটি আপনি বলছেন না যে এই সময় পিকে যাওয়ার..১০, ১৫ তারিখের দিকে দিকে পিকে যাবে| তারমানে কোরবানি ঈদের পরে আরও উঁচুতে যাবে?

ডা. মুশতাক হোসেনঃ হ্যাঁ.. না পিক থেকে নেমে যাবে আশা করি, কুরবানীর সময় সংক্রামন নেমে যাবে কিন্তু কোরবানি সময় যে চলাচল টা হবে কুরবানীর দুই সপ্তাহ পরে আমরা শহরঅঞ্চলে কিন্তু অনেক বড় সংক্রমণ দেখব| কোরবানিতে যে সংক্রমণ টা মানুষে মানুষে ট্রান্সমিশন হবে সেটার ইফেক্টটা আরো দুই সপ্তাহ পর দেখা যাবে| কাজে তখন কিন্তু আমরা শহরাঞ্চলে অনেক রোগী দেখব| সেজন্য শহরাঞ্চলে ফিল্ড হাসপাতাল করা দরকার, গ্রামেও করা দরকার| ফিল্ড হাসপাতালে যারা রোগের লক্ষণ যুক্ত কিন্তু বাসায় থাকতে পারছেন না তাদেরকে রাখা হবে| তাদেরকে যদি আগে থেকেই মেডিকেল ইন্ট্রোভেশন দেওয়া যায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় যাবেন না| হাসপাতলে ভিড়টা কমে যাবে, আইসিইউতে ভিড়টা কমে যাবে| এই কাজগুলো এখন প্রস্তুতি নেওয়া দরকার এবং গ্রামাঞ্চলের এখানে সংক্রামনটা বেশি, একটা স্কুল ঘরে খাট পেতে রোগী.. যারা কম গুরুতর রোগী তাদেরকে রাখা হয় একজন প্রশিক্ষিত ডাক্তার ১০ জন ভলেন্টিয়ার নিয়ে ৫০ জন রোগীকে সামাল দিতে পারে| এই এটা দরকার সামাজিক উদ্যোগ| সেই সামাজিক উদ্যোগ যারা নিতে পেরেছে সেখানে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ হবে|না হলে কিন্তু আমাদের আই সি ইউ বেডের জায়গা পাবেনা এবং আইসিইউ না যেতে পেরে কিন্তু মানুষের করুণ পরিণতি আমাদের দেখতে হবে|

জিল্লুর রহমানঃ জি আমি আসবো আবারো আপনার কাছে ডা. মুশতাক হোসেন| প্রফেসর মোহাম্মদ বিললাল হোসেন আপনি পরিস্থিতি কেমন দেখছেন?

ড. মোহাম্মদ বিললাল হোসেনঃ ধন্যবাদ তৃতীয় মাত্রা এবং চ্যানেল আইয়ের দর্শককে| অনেকগুলো বিষয় মুশতাক ভাই হাইলাইট করেছেন| লোকতাত্ত্বিক যে নির্দেশনার দিকে যাব সে জায়গা গুলো মুশতাক ভাই খুব চমৎকারভাবে বলেছেন ইতিমধ্যে| আমরা আসলে কোন দিকে যাচ্ছি সেই দিকটা আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি কারণ আগে থেকে আসলে আমাদের কাছে যে লোকতাত্ত্বিক তথ্য ছিল সেই তথ্য দিয়ে আমাদের যে প্রজেকশন ছিল সেই প্রজেকসনে আমরা কিন্তু জুলাইয়ের ১০ তারিখ থেকে আমাদের পার ডে ১০ হাজারের মতো ইনফেকশন রেট আসার কথা ছিল যে প্রজেকশন ছিল| কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার আগে থেকেই ১০ হাজারে চলে আমরা গেছে| আজকে ৬ তারিখ

গতকাল ১০ হাজার ছিল প্রায়, আজকে ১১ হাজারের উপরে।সো সেই প্রজেকশন টা আমরা কিন্তু আর্লিই পেয়েছি এবং সেই আর্লিপাওয়ার যেই মূল জায়গা গুলো সেই জায়গাগুলো আসলে সারাবিশ্বে আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে কথা হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা তো আসলে আচরণের সাথে সম্পর্কিত। এটা আচরণ বিজ্ঞান দিয়ে আসলে ব্যাখ্যা করতে হয়। অর্থাৎ বিহেভিওরাল সাইন্স। কেন আসলে এভাবে হচ্ছে আমরা মুশতাক ভাই যেটা বলল যে লকডাউন শব্দটা পছন্দ না। লকডাউন শব্দ টা আসলে আমিও পছন্দ করি না। লকডাউন তো আসলে কভিডের জন্য সমাধান না। লকডাউন হচ্ছে যে আপনি যখন একেবারে ডেথ এন্ডে আছেন তখন আপনি লকডাউন দিয়ে আপনি এটাকে প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু লকডাউন এর আগে আসলে যে কাজগুলো আমাদের করা দরকার সেই কাজ গুলোই আমরা ঠিকমত হচ্ছে কিনা বা ঠিকমতো কিভাবে করা যায় সেই জায়গাগুলোতে মনে হয় আমাদেরকে যেতে হবে। এখন যে বাস্তবতা আছে আমরা মানে অনেক দূরের উদাহরণ তো আসলে আমাদের হয়তো আমরা দেখতেও চাইনা না বা সবাই দেখতে পারে না বা বুঝতে পারে না কিন্তু প্রতিবেশী দেশ ভারতের উদাহরণ টাতো আমাদের সামনে আছে যে প্রতিবেশী দেশ ভারতের কতদিন আসলে এই পিক টা ছিল তারপরে কিভাবে আসলে এটা নেমেছে। তো এটা এখন যে পিকে আছি এবংযে পিক টা আসলে আমরা কন্ট্রোল করার জন্য জুলাইয়ের ১ তারিখ থেকে আমরা যে কঠোর লকডাউনের কথা যেটা বলছি সেটা যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে ডেফিনিটলি আমরা এটা আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে একটা সুফল পাব। যে এই পিকটা আসলে কারভটা ডাউন ওয়ার্ডএ যেতে থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা কি আসলে এই লকডাউন নামক যে যন্ত্র সেই যন্ত্র টা দিয়ে কি আসলে আগামী তিন সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ যেভাবে আমরা যাচ্ছি আপনি যেটা বললেন যে আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি যে দ্বিতীয় সপ্তাহ এক্সটেনশন টা হয়ে গেছে। কিন্তু আজকে ষষ্ঠ দিনের চিত্রটা যদি আমরা দেখি আসলে চিত্রটা কি। কেন আসলে এরকমটা হচ্ছে বা সামনের দিনগুলোতে আরো কেমন চিত্রটা হতে পারে। আজকের ঢাকা শহরের অনেক জায়গায় আপনি দেখেছেন যে ট্র্যাফিক জ্যাম হয়ে গিয়েছে। কেন আসলে এটা হচ্ছে। মনে হয় যে এই আচরণগত জায়গায় আসলে আমাদের কাজ করা দরকার। মুশতাক ভাই কিছু বিষয় বলেছেন আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই কোভিড নামক মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আসলে আমাদের জনসম্পৃক্ত কোন বিকল্প নেই আসলে। কিন্তু আমরা সেই জনসম্পৃক্ততার আমরা আসলে কতটুকু করতে পারছি। অর্থনীতি অবশ্যই আমাদেরকে চালু রাখতে হবে। কারণ ঘরের মধ্যে বসে থাকলে আমাদের পেটে খাবার জুটবে না সে কাজটা করতে হবে। কিন্তু আচরণগত যে পরিবর্তনের জায়গা আমরা যে তিনটা জায়গার কথা আমরা বলছিযে মাস্ক পড়া, সোশ্যাল ডিসটেন্স এবং আমাদের যে হাত ধোয়া। তো হাত ধোয়ার কাজটা ঘরের মধ্যে বলে আমরা আসলে কেউই দেখতে পারছি না বুঝতে পারছি না। সেই জায়গা তা নিয়ে আমরা কথা ও বলছি না। কিন্তু যেটি আমরা রাস্তাঘাটে দৃশ্যমান বা দেখতে পাই আপনি যেটা বললেন যে ৬০ পার্সেন্ট মানুষ মাস্ক পরে থাকে তারও আবার ৮০ পার্সেন্ট মানুষ মাস্ক পরে থাকে যে অবৈজ্ঞানিকভাবে অর্থাৎ যেটা দিয়ে তার কোন প্রিভেনশন হয়না এটি তার গলায় ঝুলানো থাকে। তো এই জায়গাটায় আসলে কাজ করতে হলে জনসম্পৃক্ততার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ জনগণকে আসলে বুঝাতে হবে যে আমরা আসলে কিসের মধ্যে দিয়ে আছি এবং এটার ইম্প্যাক্ট কোথায় যেতে পারে। আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলবো যে আসলে আমাদের জনগণকে সচেতন করার যে জায়গাটা সেটা আসলে ঐতিহাসিকভাবে আমাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা বলে যে বিষয়গুলো সে বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল না। এখনও আমরা সে কাজটি করতে পারিনি। কারণ আমি দেখছি যে একই পরিবারের একজন মারা গেছে কিন্তু তারপরেও তাদের মধ্যে বোধোদয় হচ্ছেনা যে আসলে কিভাবে সবসময় মাস্কটা পড়ে নিজেকে সুরক্ষা..মানে দিবে। সেই কাজটি কিন্তু আসলে আমরা করছি না। সেই কাজটা করার জন্য আমার কাছে মনে হয় যে স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়টা আসলে তো একটু লংটার্ম আমাদের কারিকুলাম এর মধ্যে নাই, আমাদের সামাজিক প্রথার মধ্যে নাই। তো সেই জায়গাগুলোতে আসতে আসলে একটু সময় লাগবে।কিন্তু এখন যেটি করা যেতে পারে আমার কাছে মনে হয় যে গাছুক লেভেলের আমাদের যে জনসম্পৃক্ততা সে জনসম্পৃক্ততা আমরা কি ভাবে বেড়াতে পারি। আমাদের গাছুক লেভেল আসলে খুব চমৎকার একটি সিস্টেম আছে।এটি মুশতাক ভাই হাইলাইট করেছে।আপনি দেখেন আমাদের গ্রামীণ স্বাস্থ্য কাঠামো ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডএ একজন আপনার কি বলে যে.. একজন ফ্যামিলি হেলথকেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট

আছে, একজন স্বাস্থ্য সহকারি আছে| এখন প্রায় ১৩ হাজারের উপরে যে কমিউনিটি গুলো সে কমিউনিটি অর্থাৎ গড়ে প্রায় করে ৬ হাজার মানুষের জন্য একজন কমিউনিটি হেলথকেয়ার যেটাতে আমরা সিসিটি বলি তারা আছে| এবং এর পাশাপাশি আমি জনসম্পৃক্ততা শুধুমাত্র স্বাস্থ্য বিভাগের মধ্যেই রাখা বোধহয় ঠিক হবে না| এধরনের প্যান্ডেমিকে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য বিভাগ আসলে আমাদেরকে যে খুব বেশি উপকারী ফল এনে দিবে ব্যাপারটা তেমন নয়। এখানে একটা সমন্বিত কাজ আমাদের লাগবে|এখানে স্বাস্থ্য বিভাগের পাশাপাশি আমাদের স্থানীয় সরকার বিভাগ আছে| আপনি জানেন যে ওয়ার্ড পর্যায়ের আমাদের একজন করে মেম্বার আছেন| আমাদের প্রত্যেকটা গ্রামে যে শিক্ষা বিভাগের যে শিক্ষকেরা আছেন এদেরকে কি আমরা আসলে ওভাবে মোটিভেশন দিতে পেরেছি? নাকি ওদেরকে আমরা মোটিভেশন দিয়ে নিজেরা সুরক্ষিত হয়ে তার আশে পাশে যারা আছে তাদেরকে আসলে কি আমরা সুরক্ষার জায়গায়.. সুরক্ষার মেসেজ গুলো দিতে পেরেছি| আমার কাছে মনে হয় যে এই কাজটা আমাদেরকে সব থেকে বেশি করা দরকার ছিল| আমরা কিন্তু টপ লেভেল এর পলিসি লেভেলেও আমাদের কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে এই মুহূর্তে সুরক্ষা হচ্ছে যে মানে ভ্যাকসিন যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে আমার হাতে নাই মাস্ক| কিন্তু এই যে মেসেজটা এই মেসেজটা আমাদেরকে ট্রান্সলেট করতে হবে গাছুক লেভেলে| ট্রান্সলেট করার জায়গাটা আমাদের খুব জোরালোভাবে নেওয়ার দরকার ছিল| যেটা এখনো আমাদের বহু বছর ধরে আমাদের আসলে কাজটা করতে হবে| আমরা একটা নরমাল দিকে বোধহয় আমাদের একটা লম্বা সময় ধরে থাকতে হবে|তো সেই কাজটা করার জন্য আসলে আমি মনে করি যে আমাদের খুব জোরালোভাবে জনসম্পৃক্ততা লাগবে এবং পাশাপাশি আপনি যে লিংকের কথা বলছেন সেই জায়গাটা আমি.. মুশতাক ভাই এই জায়গাটা হয়তো আরো ভালো করে বলতে পারবেন কিন্তু আমি যেটা বুঝছি সেটা হচ্ছে যে.. আপনি নিজে ও বলেছেন যে গ্রামীণ কাঠামোটা আসলে টেস্টিং এর অপরচুনিটি টা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কিন্তু সেখানে সেই বাঁধাগুলো এখন উপক্রম করার বা ওভারকাম করার কিছু মেকানিকের জমে এসেছে যে আমরা যদি এখন অ্যান্টিজল টেস্টিং করতে পারি তাহলে সেই অ্যান্টিজল টেস্টিং এর মাধ্যমে কিন্তু আমি দিতে পারি। কিন্তু আমি এই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের টেস্টিং এখনো অনেক বাড়ানোর দরকার সেই বাড়ানোর জায়গাটায় আমরা কাজ করতে পারছি না ঠিক পথে এবং টেস্টিং করা পরে যে জায়গাগুলোতে আমাদের যাওয়া দরকার। আমরা তো শুরু থেকেই কনফার্টেসিং এর কথা বলছি সেই কনফার্টেসিং আসলে আমরা করতে পারছিনা। যদিও এখন আসলে কনফার্টেসিং যেহেতু আমাদের ৩০% ব্রেক হয়ে গেছে এখন কিন্তু আর কনফার্টেসিং আমাকে খুব বেশি যে হেল্প করবে তা না। কিন্তু কনফার্টেসিং না করে অন্তত তাদেরকে যদি পর্যাপ্ত টেস্টিং এর মধ্যে এনে তাদেরকে যদি আমি একটা আইসোলেশনও বলবো না আমি যদি তাকে একটা সুরক্ষা বলয় এর মধ্যে রাখি সেটা আবার খুব জরুরী। আর পাশাপাশি এই জায়গাটায় আমি বলবো যে আমাদের কি বলে মুশতাক ভাই হাইলাইট করেছিল আমি গত বছর প্রথম দিকেই কোভিড শুরু হওয়ার পর থেকে আমরা একটা গবেষণা করেছিলাম স্টিগমার উপরে। তো আমি মাঝখানে ধারণা ছিল যে হয়তো সময়ের সাথে সাথে স্টিমাটার পরিমাণ একটু কমে গেছে কিন্তু আমি রিসেন্ট কিছু অভিজ্ঞতা যেটা আবার দেখতে পাচ্ছি আসলে স্টিমাটা কমেনি। এটা একই পর্যায়ে আছে এবং সেই স্টিমাটার পেছনে কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোবদ্ধ স্টিগমা থাকে। আমাদের যখন বিদেশ ফেরত লোক আসলো হাতে একটা সিল মেরে দিলাম বা আমার বাড়িতে যে লাল পতাকা দিয়ে দিলাম এইগুলি আসলে এক ধরনের প্যানিক ক্রিয়েট করা, প্যানিক ক্রিয়েট করে আসলে কোনো লাভ হবে না। আবারও সেই একই জায়গায় যেতে হবে প্যানিক ক্রিয়েট করার পরিবর্তে বরং তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তাদের যে আচরণগত পরিবর্তন সেই আচারণ গত পরিবর্তনের বিষয়গুলোতে আসলে আমাদের কাজ করতে হবে। খুব জোরালোভাবে এটাকে সম্বন্ধিত কর্মপদ্ধতি আমাদের ড্রাগফুড লেভেলের যারা আমাদের আছে অনেক লোক আছে তাদেরকে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এই সম্প্রীতি কাজটা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে কিন্তু এই যেটা কোভিড প্রিভেনশনের জায়গা ভ্যাকসিন তো আমাদের আছেই কিন্তু ভ্যাকসিনের যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং আমাদের যে দেশীয় প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটটাকেও আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। এই যে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যে ডিপ্লোম্যাটিক জায়গাটা আছে সেটাও আমাদেরকে বিবেচনায় রাখতে হবে। সেই বিবেচনায় আমি মনে করি যে ভ্যাকসিনের...

জিল্লুর রহমানঃ আমরা ভ্যাকসিনের আলোচনায় একটু পরে আসি। আমার মনে হয় ভ্যাকসিনের আলোচনা নিয়ে একটু....

ড. মোহাম্মদ বিললাল হোসেনঃ সেটা থেকে আমাদের যে মানে প্রিভেনশন এর যে জায়গাটা সেই প্রিভেনশনের জায়গাটায় যেতে হবে। আর গরুর হাট খোলা রাখতে হবে কিন্তু গরু হাটে কেউ যেন একটি লোককেও মাছ ছাড়া না দেখে সেই ব্যবস্থা টা আমার রাখতে হবে। কিন্তু সেই জায়গাটায় আমরা কাজ করতে পারছিনা এবং পাশাপাশি এই জায়গাটায় আরেকটা বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই আনতে হবে যে জীবিকার জায়গাটা যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী দ্বারা সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কিন্তু ঘরের মধ্যে থাকবে না সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তার পেটের দায় মিটিয়ে আসলে বাইরে আসবে। তো সেই তাকে ঘরে থাকার ব্যবস্থাও যেমন আমি করতে হবে। অর্থাৎ তাকে যে অর্থনৈতিক সুরক্ষা দিতে হবে এবং বাইরে যেন সে আসে সেজন্য মাস্ক ছাড়া না আসে সে জায়গা তাকে যেমন সচেতন করতে হবে, সেটা তো দীর্ঘমেয়াদি কাজ। এটা অবন্যায় হবে না। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যেটা আমার বলা দরকার সেটা হচ্ছে এখানে আমাদের স্ট্রং ভিজিলেন্স যেটা দরকার যে ভিজিলেন্সের মাধ্যমে আমরা তাদেরকে মাস্কটা যাতে আমরা রাখতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করব। সেই ব্যবস্থাটা আমরা যে লকডাউন এর মধ্যে যে যাচ্ছি সেটা হয়তো আমরা আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে একটা সুফল পাবো।

জিল্লুর রহমানঃ ডা. মুশতাক হোসেন আপনার কাছে কয়েকটা ছোট ছোট প্রশ্ন আমার। এক হচ্ছে যে, যে তথ্য পথ আমরা পাই বা যেটি ব্রিফ করা হয় সেটি যথাযথ কিনা? মানে এমন কোনো মানুষ আছে কিনা যারা মারা যাচ্ছেন বা আক্রান্ত হচ্ছেন কিন্তু হিসেবের মধ্যে কোন ভাবেই ওই নেটওয়ার্কের মধ্যে কোন ভাবে পড়ছেন না। এটি একটি আমার প্রশ্ন আপনার কাছে। দ্বিতীয়ত কয়েক দফায় আমরা সাধারণ ছুটি, লকডাউন, শাটডাউন, কঠোর লকডাউন নানান কিছু শুনলাম এই যে কয়েক মাসে বা গত বছর থেকে যা কিছু হচ্ছে, আপনার কাছে মনে হয়েছে কিনা বিজ্ঞানসম্মতশিল লকডাউন বা শাটডাউন আমরা করতে পেরেছি। আমার তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে, আমরা দেখি এখন যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এখন অনেক এগিয়েছে। আমরা অনেকেই শুনি এবং বলি সেটি। বাংলাদেশে কোন মানুষ না খেয়ে মারা যায় না। সো আমার প্রশ্ন যদিও আমরা ঠিকঠাকমতো বিজ্ঞান সম্পন্ন ১৫ দিনের বা এক মাসের তিন সপ্তাহের লকডাউন করতাম খুব কি অসম্ভব বাংলাদেশের সামর্থের? যে এই কয়েকজন মানুষকে যাদের জন্য প্রয়োজন তাদেরকে আমরা ঘরে খাবার পৌঁছে দিতে পারতাম না। আর শেষপ্রশ্ন আপাতত এই পর্যায়ে সেটি হচ্ছে যে, সামনে যে কোরবানির ঈদ আছে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এখন পর্যন্ত ১৪ তারিখ পর্যন্ত লকডাউন এবং আপনি বলছিলেন কুরবানী ঈদের পরে আবার এটা টিকে উঠবে সেই ক্ষেত্রে এই ঈদ ঈদের সময়টা আসলে আমাদের কি করা উচিত।

ডা. মুশতাক হোসেনঃ জি ধন্যবাদ আমি ভুলে যাই আমাকে মনে করিয়েদেয়ায় লিখেছি কিছু। প্রথম সড়ক পরিবহন এবং মৃত্যুর তথ্য দেখুন এই ধরনের মহামারী সময় এই তথ্যটা আছে ওগুলো তো সার্ভিলেন্স বা ভারত নজরদারি ব্যবস্থা। এখানে ধরে নেওয়া হয় সংক্রমণ যখন কম থাকে কমপক্ষে ১০ গুণ এর বাইরে আনডিটেকটেড থাকে। এটি লক্ষণযুক্ত বা লক্ষণ ছাড়া থাকে। এটা আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক বা ডেস্পিরেস্পিরেশন থাকে দেখা গেছে। অনেক মানুষ অ্যান্টিবায়োটিক কিছু শরীরে পাওয়া যায় কোন না কোন সময় লক্ষণযুক্ত বা লক্ষণ ছাড়া সংক্রমিত হয়েছে। আর এখনকার চেয়ে ক্রিক পয়েন্ট এই ক্রিক পয়েন্টে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা যখন লাস্ট হলো সোয়াইন ফ্লু নামে খ্যাত সোয়াইন ফ্লু বাংলাদেশে ইনসিওর ইন ওয়ান প্যানডেমিক ২০০৯। ৩০-৪০ গুন মানুষ আপনার শনাক্তের বাইরে থেকে। এটা বললে কিন্তু অনেকেই আঁতকে ওঠেন যারা এখন ১১ হাজার ৩০ গুন করলে কত হয়? আঁতকে ওঠার কোনো কারণ নেই এটা স্বাভাবিক। কারণ সব দেশেই এটা হয়ে থাকে এটা একেবারে সমস্ত রোগীকে আপনি শনাক্তের আওতায় আনবেন এটা কখনোই সম্ভব না। এরকম যখন সংক্রমণটা উচ্চ পর্যায় যায় তখন নিয়ম হলো যাদেরই লক্ষণ আছে তাদেরকেই সম্ভাব্য রোগী শনাক্ত করে

তাকে আইসোলেশন নিয়ে নেওয়া। তাকে ব্যবস্থাপনায় নিয়ে যাওয়া। কাজেই এখন এই সিজনে যাদের এখন এই যদিও এখন ইনফুয়েঞ্জা সিজন আছে এখন সর্দি কাশিও হচ্ছে। ঘন ঘন শ্বাস কষ্টের রোগ হচ্ছে কিন্তু জ্বর কাশি হলেই প্রথমেই ধরে নিতে হবে যে তার করনা হয়েছে তিনি টেস্ট করতে পারেন কিনা ই পারেন? এবং তাদেরকে ব্যবস্থা করে আনতে হবে তাদেরকে আলাদা করে রাখতে হবে। কাজেই এটা হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য এবার আমরা এরকম সময়ে যে তথ্য পায় অনেকেই এটা বলেন ডিপ অফ দি আইস বার্গ। এটা বললে আঁতকে ওঠার কোনো কারণ নেই এটাই স্বাভাবিক কারণ সবাইকে টেস্ট এর আওতায় যারা নাগরিক তারা নিজেরাও আসেনা মহামারী প্রচন্ডতার কারণে আবার স্বাস্থ্যব্যবস্থা যতই শক্তিশালী হোক না কেন একেবারে সবার ঘরে ঘরে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। তো যাই হোক তারপরে হচ্ছে আপনার প্রশ্ন যে জনস্বাস্থ্যে বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রণ লকডাউন মানে না কেউ

জিল্লুর রহমানঃ আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কখনো করেছি কিনা ১৫ দিন এক সপ্তা আজকেও দেখি ডক্টর দুলাল হোসেন বললেন যে রাস্তার এখনো ঢাকার অনেক জায়গায় ট্র্যাফিক জ্যাম এবং ইউজুয়ালি আমি তো প্রতিদিনই কাজের কারণে বের হতে হয় আমি অন্য সময় ঢাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের যে পরিমাণ দেখি এই সময়টাতে কিন্তু আমি দেখিনি তাদেরকে। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যে টুকু বলতে পারি।

ডা. মুশতাক হোসেনঃ না আমার অভিজ্ঞতাটা ও অনেক সময় উল্টোটা হয় আজকে যখন আমি দুটো চেকপোস্ট অতিক্রম করেছি একটা চেকপোস্ট ধরলাম সে যাই হোক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটা বিষয় অবগত আছে তারা তাদের সম্পর্কে

জিল্লুর রহমানঃ কিন্তু আমরা তো জানি যে বিজিবি সেনাবাহিনী সবাই সবাই নেমেছে সেরকমই জানানো হয়েছে।

ডা. মুশতাক হোসেনঃ হ্যাঁ গোটা বাংলাদেশে যেখানে সংক্রমণ বেশি সেখানেও আছে। যাই হোক সেটা তো আছে তারা এই দিকে ঢুকে দেখুন সবচাইতে আদর্শ মডেল হচ্ছে লকডাউন মানে খ্যাত উহান মডেল চীনে যেটা এখন শুরু হয়েছে। তারা প্রায়ই তারা আমি ঠিক তারিখটা মনে নেই তারা বিল্লাল হয়তো বিনা বেশে বলতে পারবে মানে আমার মনে হয় আড়াই মাস এর মতো তারা বন্ধ রেখেছিল সবকিছু। এবং আদর্শ লকডাউন করে ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, থাইল্যান্ড, ভুটান আমাদের বাড়ির পাশে। তাদের এই যে তারা উতরে পারে না অবশ্যই জনস্বাস্থ্যের কাঠামো তাদের তৃণমূল পর্যায়ে আছে। আমাদের শহরে নেই গ্রামে কিছুটা আছে। রাস্তা আল্পিক থাইল্যান্ডে বলুন কুচিবাড়ি অস্ট্রেলিয়ায় বলুন আর সমাজতান্ত্রিক চীন বৃত্তান্ত তাদের একটা বিষয় মিল আছে তারা তাদের স্থানীয় সরকার খুবই শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনেক রিসোর্স অনেক এবং সেখানে স্বাস্থ্য কাঠামো আছে পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভুটানেও তাই সমস্ত মানুষকে তার মেসেজ জ্ঞানের ভিত্তিতে তাকে যদি আপনি ডঃ বিলাল বার বার বলেছে তাহলে আপনি তখন যদি আপনি তাদেরকে একটু জোরজবরদস্তিও করেন শাস্তি দেন তাহলে কিন্তু সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। এখন কেন আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী শাস্তি দিতে পারছে না। তারাতো শাস্তি দেন রাজনৈতিক সহিংসতার সময় তারা তো চূড়ান্ত কঠোরতা প্রদর্শন করে কিন্তু সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক একটা চিন্তিত আছে সেটা বিএনপি বললেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি।

জিল্লুর রহমানঃ শুধু সহিংসতার সময় নয় অন্য সময়ও তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে তখন যারাই ক্ষমতায় থাকেন না কেন সঙ্গে থাকা না হলেও তারা অনেক সময় নীতি নির্ধারণ করেন।

ডা. মুশতাক হোসেনঃ কিন্তু জনস্বাস্থ্যের সমস্যা তো আপনি নির্দিষ্ট কোন চিহ্নিত লোককে চিহ্নিত করার বিষয় নয়। জনস্বাস্থ্যের সমস্যা হচ্ছে ব্যাপক জনগণকে একজাতের ভিতরে তারা যেন ঘরের বাইরে না আসে সেই বিষয়ে নিশ্চিত করা। সেখানে যদি আপনি

জিল্লুর রহমানঃ সেখানে যদি আপনি জীবিকার জন্য আসেন জীবিকাটা যাদের জীবিকা সরকার তাদেরকে জিবি কাটা পৌঁছে দেওয়া কি অসম্ভব কিনা?

ডা. মুশতাক হোসেনঃ হ্যাঁ এখানেই আমি আসছি আমি আগেই বলেছি বাংলাদেশ একটি পরিপূর্ণ বাঙাল রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারেনি। যে পরিমাণ সাংগঠনিক কাঠামো প্রশাসনিক সদিচ্ছা যেমন পলিটিক্যাল গ্রোথ বাড়বে সেটা কিন্তু আমরা এখনো করতে পারিনি। যদিও আমাদের সঙ্গে তাদের এটা করবার কথা বলা আছে। এখন একটা মিনিমাম সচ্ছল মানুষকে প্রায় আড়াই হাজার টাকা করে দিচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। যারা পাচ্ছে তাদের কাছে এটা সামান্য আর এর বাইরেও বিরাট সাধারন মানুষ এর আওতার বাইরে থাকছে। এর চেয়ে বেশি করা আমার মনে হয় না সরকার কতটুকু পারবে জানিনা। যদি তাদের ডিসট্রিবিউশন মেকানিজমটা ত্রুটিমুক্ত হতো পলিটিক্যাল মেকানিজম এবং প্রশাসনিক মেকানিজম বিশেষ করে রাজনৈতিক যে মেকানিজমটা আছে প্রথম ঢেউয়ের সময় যেটা বলি একবার চেষ্টা করা হয়েছে সেখানে যদি শতকরায় ১০ ভাগ মানুষ দুর্নীতি করে থাকে এটা গোটা সিস্টেমকে বয়েল করার জন্য যথেষ্ট। কারণ যারা অ্যাসিস্ট্যান্টরা ভালো চোখে দেখে না যে রাজনৈতিক মানি রেক্টারিং যে রেট সে এই করোনা মহামারী বিষয়টা কাজ করবে তারা একদম লুফে নিয়েছে। তারা দেখিয়েছে রেকর্ড জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে যদি আপনি ত্রাণ বিতরণ করেন এখানে সিস্টেম লস হবে মানি লস হবে কাজেই আমরা করবো আমরা যতটুকু পারি ওর বেশি আর হবে না। যাই হোক সেই বিষয়ে আমি যাচ্ছি না আজকে। এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে সেক্ষেত্রে আমি বলি এই ঘাটতি পূরণ করার জন্য একতরফা সম্ভব এটা মানে মানুষকে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া বা সামাজিক সহযোগিতা অসম্ভব নয় বাংলাদেশ সম্ভব হচ্ছে সরকারি ব্যবস্থার সাথে সাপ্লিমেন্ট করতে হবে সেই এলাকার সামাজিক উদ্যোগ। সেখানে অবশ্যই অধিকাংশ লোক না খেয়ে থাকে না যারা যাদের ঘরে অতিরিক্ত খাবার আছে অতিরিক্ত সম্পদ আছে তারা যদি যারা বঞ্চিত মানুষ তাদেরকে শেয়ার করে মার্চ এপ্রিল মাসে হয়েছে। অবশ্যই মানুষকে আমরা আড়াই মাস প্রয়োজন হবে না দুই থেকে তিন সপ্তাহ বসেই ভালো রাখতে পারবো। এই শক্তিটা জাগিয়ে তুলতে হবে। এটা অসম্ভব নয় তাহলে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আমরা মানুষকে ঘরে রেখে আপাতত সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেতে পারি। কিন্তু একটা কথা আছে আপনি যদি সংক্রমণটাকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনেন শূন্যের কোঠায় যদি দুই সপ্তাহ থাকে তাহলে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই লোক বলতে পারে মুক্ত এখন। কিন্তু আপনি মুক্ত না কারণ সারা বিশ্বে যদি কোরোনা সংক্রমণ থাকে তা আপনি সারা বিশ্বের সাথে দেয়াল তুলে থাকতে পারবেন না। আপনি মানুষের মানুষের চলাচল বন্ধ করলেও আপনার সেখানে মালামাল চলাচল হবে মালামালের সঙ্গে মানুষ আসবে। কাজেই এটা কোন দেশি এমনকি চীন, ভিয়েতনামও ও অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড কিংবা থাইল্যান্ড, ভুটান একেবারে পার্মানেন্টলি তারা সিল করে করণা সংক্রমণ ঠেকাতে পারে নাই আবার বেড়েছে। কাজেই আপনি যদি ২,৩ সপ্তাহ বা ৪ সপ্তাহ কঠোর বিধিনিষেধ দিয়ে যাতায়াত বন্ধ রেখে কোরোনা শূন্য করে ফেলেন দুই সপ্তাহের জন্য তারপরও তুলনা করন সময় আবারো করোনার সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনেক কারণ আছে একটা হচ্ছে বিদেশ থেকে আসা ভালো ভালো খদ্দেরের কারণ আছে আমাদের ঘরে যে পোষা প্রাণী গুলো আছে বিড়াল কুকুর বা গবাদি পশুরও কিন্তু কোরোনা ধরা দিচ্ছে। আমরা এদেশে পরীক্ষা করছে কম। বিজ্ঞানীরা বলছে তাদেরকে টেস্ট করেন টেস্ট করে দেখো তাদের কোরোনা থাকলে তাদেরকে আলাদা করে রাখো। কারণ সেখানে তারা কিন্তু কোরোনা রোগে ভোগে না। কোরোনায় আক্রান্ত হলে তারা রোগগ্রস্ত হয় না। কিন্তু এটা রিগ্রেট করতে পারে। আমাদের চেয়ে পোষা প্রাণী গুলোর কোরোনাভাইরাসটা তারা জবাব দিবে মিউটেশন মিউটেশন করতে পারে। যাই হোক আমরা মানুষের টেস্ট করতে পারছি না সেখানে গবাদিপশু তাও করা উচিত। কম হলেও করা উচিত। এর পরে আসি যে আপনি যে কুরবানীর কথা বলছেন কুরবানীর সময় এটা সবচেয়ে আদর্শ হতো যে আমরা কোন চলাচল করতে দেবো না কোন কুরবানির হাট বসেছে দেব না ঈদের জামাত হবে না

বাসায় নামাজ পড়বে এবং কোনো কুরবানির ঈদগায়ে পশু কোরবানির মাধ্যমে কুরবানী হবে না বিকল্প উপায়ে কুরবানীর সোয়াব হতে পারে। আসলে কি আমরা সেটা পারবো বলুন? আমি মনে করি সেটা সম্ভব নয়। যে সমস্ত প্রায় গথিক মানুষ আপাতত এই দুই সপ্তাহের বিধি নিষেধ এই তাদের না বিশ্বাস হয়ে গেছে কুরবানী কেন্দ্র করে সেই গরু হাট বা গবাদিপশুর হাট কিংবা যে দোকানপাটের কেনাবেচা এটাকে যদি না খোলা যায় তাহলে এই সমস্ত সীমিত আয়ের মানুষ ছবে কেন। মাঝারি আইয়ের মানুষের নাভিশ্বাস উঠবে আপনি নির্দেশ দিলেও তারা এটা মানবে না এবং যারা প্রান্তিক মানুষ সারা বছর গরু ছাগল লালন পালন করেন কোরবানির হাটে বিক্রি করার জন্য তাদের খরচ টা যেন অন্তত ওঠে তারা যদি সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঢাকায় খুবই ভালো তাদেরকে হাটে আসতে হবে না। তো সেই কথা কিন্তু আগেই বলেছি পরিপূর্ণ করলাম রাষ্ট্রপতি সহমত ছিল শক্তিশালী স্থানীয় সরকার হলে তারাই ট্রাক ভাড়া করে ইউনিয়নের কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন কাউন্সিলর তারা সেই গবাদিপশু বাড়ি বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে তারা শহরে পাঠিয়ে দিত অনলাইনে কেনাবেচার জন্য। আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই কুরবানীর সময় আরো যে পদ্ধতি আদর্শ যে পদ্ধতি সেটাকে মানা আমাদের কম্প্রোমাইজ করতে হবে বা যতখানি আমাদের আপোষ করতে হবে ততখানি ঝুঁকি বাড়বে এবং কুরবানীর দুই সপ্তাহ পরে আবার সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী দেখা দিতে পারে। যদি সংক্রমণ কমে যায় কোরবানির আগে আগে আমি জানিনা আনুমানিক কথা ডাক্তার বেলাল আওয়ামী লীগের মডেলিং এর সাথে জড়িত আছে তিনিও তাড়াতাড়ি মডেলিং করবেন। কিন্তু আমরা সাদা চোখে যেটা তৃণমূল হিসেবে দেখছি মডেলিং এর বাইরেও মডেলিং এর চেয়ে মডেলিংয়ের সংক্রমণ কিছুটা কমে কুরবানী হওয়ার পর কমে না যায় আমি যেমন আশাবাদী যে কুরবানীর আগের সংক্রমণ বা অন্তত পক্ষে বিষের নিচে নামা হবে বা ১০ এর নিচে নামা উচিত যদি সেটা না হয় যদিও এখন ত্রিশের উপরে যাচ্ছে, এটা খুবই মারাত্মক অবস্থা। সংকট ২০ ঊর্ধ্বে থাকে সেক্ষেত্রে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ একদম শিথিল করা উচিত। বর্তমান ব্যবস্থা ভালো রাখতে হবে যদিও খুবই চ্যালেঞ্জ মানুষের চলাচল কুরবানী উপলক্ষে এখন থেকে বাড়বে এবং কোরবানির হাটও বন্ধ করা যাবে না। কিন্তু সেটা এখনই বন্ধ করা দরকার কিন্তু বিকল্প পদ্ধতি বের না করে সরকারের পক্ষে এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। সরকার অবশ্যই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মাননীয় সংসদ সদস্য উপজেলা চেয়ারম্যান সবাইকে নিয়ে আর তাই নিয়ে এই কাজটি করতে হবে তাহলে কিন্তু অনেক খানি প্রমাণ পাওয়া যায়। ধন্যবাদ।

জিল্লুর রহমানঃ প্রফেসর বিললাল হোসেন।

ড. মোহাম্মদ বিললাল হোসেনঃ ধন্যবাদ আমি আপনার শেষে জায়গাটা একটু হাইলাইট করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে আসলে আমরা কি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে লকডাউন করেছে কিনা? মুস্তাক ভাই ওহান এর উদাহরণ দিয়েছ উন্নত বিশ্বের উদাহরণ দিয়েছ সেই জায়গাগুলো আমরা দেখেছি। কিন্তু আমাদের কাঠামোর সঙ্গে সেই জায়গা গুলোর কাঠামো কিছুটা কিছু ভিন্নতা আছে সেটা তো বলেছেনই। যেমন ভুটানের কথা বলতে পারি বা অস্ট্রেলিয়ার কথা বলতে পারি তাদের আসলে জনঘনত্ব এত কম, যেটা হয়তো আমরা বলতে পারি যে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা সেই সুফলটা পাচ্ছি পার্বত্য চট্টগ্রামে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুবই কম বলে সেটার সুফল আমরা পাচ্ছি। তো সেটা যে বৈজ্ঞানিক মডেল টা দিয়ে আসলে লকডাউন করার কথা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আসলে কখনোই লকডাউন এ যেতে পারিনি এবং এই বৈজ্ঞানিক মডেলের লকডাউনে যার জন্য আপনি আরেকটা ছিল। সেটি হচ্ছে যে এখন আমি মনে করি যে একটি বাংলাদেশ রাষ্ট্র তো অর্থনৈতিক সক্ষমতা মুস্তাক ভাই যদিও বলেছেন যে আমরা পুরোপুরি উন্নত রাষ্ট্র হতে পারিনি সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমাদের যে অর্থনৈতিক সক্ষমতা আমি মনে করি যে আমাদের সে অর্থনৈতিক সক্ষমতা আছে লকডাউন ম্যানেজ করার জন্য। যদিও আমি অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ না তবুও অর্থনৈতিকবীদদের কাছ থেকে যে তথ্য আমরা পাই যে আমাদের যে চাহিদা অর্থাৎ এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ঘরে রাখার জন্য কেননা আমরাতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বেশি প্রকাশ করছি যাদের রেগুলার চাকরি আছে তারা তো ঘরে বসে অফিস করেও রেগুলার টাকা ইনকাম করছে বা অনলাইনে বিজনেস করে কিছু না কিছু করছে।

কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদেরকে আসলে যদি আমাদের এক মাস খাওয়াতে হয় তাহলে কত টাকা লাগবে? আমি ২০২০ গবেষণায় দেখলাম যে আসলে তারা বলেছে যে প্রতিমাসে ৬ হাজার কোটি টাকা লাগবে তো এই প্রতিমাসে আসলে মাসের-পর-মাস তো আসলে এই লকডাউন রাখার প্রয়োজন নেই। আমি যদি একটানা ৩ সপ্তাহ যদি সাইন্টিফিক পদ্ধতিতে যে লকডাউন সে লকডাউন যদি করতে পারি তাহলে তো আমি অবশ্যই মোস্তাক ভাই যেটা বলেছিলেন আমরা ওই জায়গায় যেতে পারি। যে আমরা ৫% এর নিচে চলে আসবো। যদি আমরা একেবারে রাস্তাটা কেউ এরকম ভাবে রাখতে পারি আমার মনে হয়। বাইরের গেদারিংটাকে যদি আমি আসলে সাইন্টিফিক লকডাউন বলতে যেটা আমরা আসলে মিন করছি এই কাজটা যদি আমরা করতে পারি। তো সেটি আসলে আমাদের আমার কাছে মনে হয় না যে অর্থনৈতিক সক্ষমতা যেটি আছে সেটা জায়গাটিকে খুবই কষ্টকর আমি একেবারেই সেটা মনে করি না। আমাদের যেটা প্রয়োজন সেটা মনে হয় যে এই জায়গাটায় আসলে জনস্বাস্থ্য অর্থনীতি এই জায়গাগুলো মিলিয়ে আমাদের নীতি নির্ধারণী জায়গায় আসলে অনেকগুলো ফ্লেগজিবিলিটি আমরা করেছি। সেই ফ্লেক্সিবিলিটি জায়গাটা আমাদের আসলে ফোকাস করা প্রয়োজন। এই জায়গাটা যদি আমরা একটু কাজ করতে পারি তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে এই তিন সপ্তাহ একেবারে জোরালো ভাবে লকডাউন যেটা আমরা চাচ্ছি এই আপটাকে ডাউন করার জন্য সেটা যেতে আমাদের খুব বেশী কষ্টকর অর্থনৈতিক পর্যায়ে যেতে হবে না। বাংলাদেশের অবশেষে অর্থনৈতিক সক্ষমতা আছে। কিন্তু আমি যেটা মনে করি যে এই কাজটা করার জন্য আমাদের সম্মিলিত পরিকল্পনা লাগবে লকডাউন কিন্তু সরি কোভিড আমাদেরকে অনেক ধরনের শিক্ষা দিয়েছে সেই শিক্ষাগুলো আমরা আসলে নিচ্ছি কিনা ভবিষ্যতে আমরা সেগুলোকে নিয়ে কাজে লাগাবো কিনা সেগুলো। যেমন একটি হয়েছে যে আমি আমাদের জনসংখ্যা নিয়ে কাজ করি আমি জনসংখ্যা বিষয় এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুস্তাক ভাই যে কথাটা বললো যে গত বছর রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে প্রতি পরিবারকে আমরা আয় হাজার টাকা করে দিতে গেলাম তখন দেখলাম যে আমরা প্রচন্ড এরর আসলো। অর্থাৎ এখানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এক ধরনের যেভাবেই হোক না কেন প্রচুর ভুলভ্রান্তি এখানে এসেছে সেটা ইচ্ছাকৃত হোক অনিচ্ছাকৃত হোক সে আলোচনায় আমি যাব না। কিন্তু এই কাজটা করার জন্য আমরা কিন্তু বহুদিন ধরে পপুলেশন রেজিস্টার এর কথা বলছি যে, একটি রাষ্ট্রের পপুলেশন রেজিস্টার থাকবে সেই রেজিস্টারটাকে আপনি খুব সহজে ব্যবহার করে আপনি এই ধরনের জায়গায় সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে কাকে আপনার সোশ্যাল প্রোটেকশনের বেনিফিট দিতে হবে কাকে আপনার দিতে হবে না। এখন তো টাকা দেয়ার বিষয়টা খুব সহজ হয়ে গেছে আমাদের সময় ছিল টাকা দেয়ার ট্রানজেকশনে আমরা মোবাইল এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছি তাতে খুব সহজে আসলে গভমেন্ট তাদেরকে দিতে পারে। কিন্তু দরকার হচ্ছে যে তথ্য ভান্ডার সেই তথ্যভাণ্ডারের কাজটা কিন্তু আমরা পুরোপুরি করতে পারছি না এবং আমি জানি না আমি একজন পপুলেশন সায়েন্সেস ছাত্র হিসেবে গবেষক হিসেবে আমি জানিনা যে এখানে কি ধরনের জটিলতা আছে কিন্তু শুধু কোভিদ বিষয় না ২০১৫ সালে আমাদের যে ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্টাডিজ রয়েছে সেটির আওতায় কিন্তু ২০১৮ সালের শেষ করার কথা ছিলো কিন্তু আমরা এখনো এই কাজটি করতে পারিনি কিন্তু এটা না থাকার কারণে কিন্তু আমাদের এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষা বলায়ের হাল থাকে না। সেই কাজটি কিন্তু আমাদের জন্য খুবই জোরালো হয়ে গিয়েছে। এবং তার পাশাপাশি এই যে বিষয়টা কোভিডের কারণে এখানে আরো আপনার যে বিভিন্ন সময়ে বাণিজ্য সময়ে বিভিন্ন সময়ে উত্থান এবং পতন এখনতো পতনে সে পতনের ফলে আরো যে লোক বেড়েছে কিন্তু এই লোকগুলো আনার জন্য আসলে আমি যে আবারও একই ভাবে বলব যে আমাদের একটা সমন্বিত উদ্যোগের দরকার। সেটা আপনার আসলে স্থানীয় পর্যায়ে থেকে সেটা আপনার ইউনিয়ন পরিষদ আছে সেটা আপনার উপজেলা প্রশাসক ও উপজেলা পরিষদ আছে স্বাভাবিকভাবে আসলে আমাদের এই সমন্বিত উদ্যোগটা দরকার। যে উদ্যোগের মাধ্যমে আসলে ওই জায়গাটা চিনতে পারবো। কারণ যে জায়গাটায় আসলে আমি শেষ বক্তব্য সেটি হচ্ছে যে মুস্তাক ভাই তো মেডিকেল সাইন্সের লোক তারপরে পাবলিকেন্টের লোক একটি ভাইরাস ভাইরাস যখন এসেছে আমাদের কাছে কোন রেকর্ড নাই কে এটা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভাইরাস থাকবে। সুতরাং আমাদের এই ভাইরাসের সাথে আসলে এক ধরনের সহাবস্থানের মধ্যে থাকতে হবে ভাইরাস আমার পাশে থাকবে কিন্তু আমার শরীরে কিভাবে

আসবে না সেই মেকানিজমটা নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে। কারণ পৃথিবীতে এই পর্যন্ত যত ভাইরাস এসেছে আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নাই যে সেই ভাইরাসটা আসলে পুরোপুরি এনিমেটেড হয়ে গেছে। তো সেই জায়গাটায় আমাদের কাজ করতে হবে আমি আমাদের আচরণগত পরিবর্তন এর জায়গায় জোর দিতে চাই যে আমাদের আচরণগত পরিবর্তন এর

জিল্লুর রহমানঃ প্রফেসর বিললাল হোসেন আপনি টিকা নিয়ে বলতে শুরু করেছিলেন আমি আপনাকে থামিয়ে দিয়েছিলাম যে টিকার ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি অনেকেই মনে করেন যে টিকা একটা বড় সুরক্ষা দেবে। এখন টিকার বাংলাদেশ বড় একটা সংকট আছে সেই সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কি? প্রশ্ন আছে একটি টীকা অনেকে প্রথম ডোজ নিয়ে বসে আছেন দ্বিতীয় টিকা পাচ্ছেন না। এখন মিক্সার মেসেজ যাবে নাকি অন্য টিকা নেবে নাকি কি হবে? এই সমস্ত কিছু নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন রয়েছে সরকারি দিক থেকে প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন যে কাউকে টিকার বাইরে রাখা হবে না সমস্ত টিকার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে একটা বড় দুর্বলতা প্রথম থেকেই আছে এবং সেটি এখন পর্যন্ত থেকে গেছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কথা প্রাইসই আমরা শুনি সবাই দেবে দেবে বলছে কিন্তু কেউই দিচ্ছে না। আর যেটি পাওয়া যাচ্ছে উপহার হিসেবে বা অর্থের বিনিময়ে সেটিও যথা সামান্য। আমাদের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এইভাবে আসতে থাকলে আমরা আসলে কত বছরে টিকা সবাইকে দিতে পারবো এবং ইতিমধ্যেই যারা নিয়েছেন তাদের আসলে কবে তৃতীয় ডোজের দরকার হবে নতুন করে টিকার। কারণ যে টিকা যারা ২ ডোজ দিয়েছেন যারা সেটা কতদিন কার্যকর থাকবে সেটি নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে। প্রফেসর বিললাল হোসেন।

ড. মোহাম্মদ বিললাল হোসেনঃ দেখুন টিকার জায়গাটায় আমি আসলে সবসময় যে কথাটা বলি আমাদের মধ্যে টিকার ব্যাপারে বেশ কিছু ভুল ধারণা আছে আমি ডাক্তার না মুস্তাক ভাই অলরেডি বলেছে, করোনাভাইরাস আমরা সবাই জানি যে আসলে ইনফ্লুয়েঞ্জার টাইপ ভাইরাস। এখন এটা খুবই নতুন একটা ভাইরাস এবং এটা নিয়ে গবেষণা চলছে। আসলে একটা টিকা নেওয়ার পরে কতদিন আমার বডিতে এন্টিবডিটা থাকবে সেই বিষয়ে কিন্তু আমরা এখনো নিশ্চিত না কিন্তু আমি আমার অন্যান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস থেকে যে অভিজ্ঞতা সেটি থেকে আপনি জানেন উন্নত বিশ্বে প্রত্যেক বছর ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের জন্য ফ্লু ভ্যাকসিন সেটা নিতে হবে। তো সেই জায়গা থেকে আমারও কনফিউশনটা হচ্ছে এরকম যে কোবিডের টিকা যখন আমরা দিচ্ছি তাহলে প্রত্যেক বছরই নিতে হবে যদি টিকা নিয়ে আমরা সুরক্ষা নিতে চাই। তো এই সাড়ে ১৬ কোটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে অ্যাডাল্ট টিকা যদি আমার সাড়ে ১৩ কোটি মানুষকে যদি আমার টিকা দিতে হয় এই টিকার জন্য কিন্তু আমরা পুরোপুরি ইমপোর্ট অবস্থান করে আমরা সেই জায়গায় যেতে পারবো না। এটিও আমার মনে হয় যে কবিরের আরেকটি শিক্ষার যে আমাদের মেডিকেল রিসার্চ এবং মেডিকেল শিক্ষা গবেষণা সেই জায়গায় যে আমরা মানে বাজেট বরাদ্দ রাখছি না আমরা আসলে স্বাস্থ্যব্যবস্থা স্বাস্থ্যসেবার দিকে আমাদের নজর আছে।

জিল্লুর রহমানঃ ১০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

ড. মোহাম্মদ বিললাল হোসেনঃ না চিকিৎসা গবেষণায় যেটা সেই গবেষণা করার যে সক্ষমতা আমাদের আমি মনে করি যে আমাদের যথেষ্ট গ্রোথ আছে এই জায়গায় প্রণোদনা লাগবে যারা ডিজিটাল বিষয়ে গবেষণা করবে সেগুলোতে করতে হবে। এবং আমি আরেকটা জায়গা পাশাপাশি মনে করি যে এখানে একটু আন্তর্জাতিক জায়গায়ও আছে আমাদের। যে আমরা এখনো কিন্তু বাংলাদেশে যে ফার্মাসিটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস সেই ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু সক্ষমতা হয়েছে এই ভ্যাকসিন যদি আমরা এই প্যাটার্ন যদি আমরা পাই আমাদের অনেকগুলো ভালো ভালো ফার্মাসিটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস আছে তারা লোকালে কিন্তু এই কাজগুলা করতে পারবে। সেটার জন্য আমাদের একটা আপনি জানেন যে ইন্টারন্যাশনাল একটা ডিপ্লোমেটিক একটা জায়গা আছে কারণ এটা গিভ এর আওতায় তারা যে ভ্যাকসিনগুলা ডেভেলপ করেছে তারা কিন্তু প্যাটার্নটা এখনই এখনই ছেড়ে দিবে না। সেই জায়গাটায় একটা গ্লোবাল ম্যাজোসিয়েসন চলছে কিন্তু

আমরা যদি পার্টনারশিপেও যেতে পারি অর্থাৎ ঐ যেহেতু প্রতিষ্ঠানগুলো আমরা যে অক্সফোর্ডে যে অ্যাস্ট্রোকনিকা কিনলাম তাদের মধ্যেও কিন্তু আমরা যদি পার্টনারশিপে গিয়ে যদি লোকাল প্রোডাকশনেও যেতে পারি, তাহলেও কিন্তু আমার গভমেন্ট তো কিন্তু এটা কিনছে তাই না? টাকা দিয়েই কিনছে। তো সেই প্রক্রিয়াটা যদি আমি পার্টনারশিপ এর মাধ্যমে যদি আমার লোকাল ফার্মাসিটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস মাধ্যমে যদি আমার প্রোডাকশনে যেতো বাংলাদেশ ফার্মাসিটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিস কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে আমরা জানি যে আফ্রিকার দেশ না ইউরোপের মধ্যেও বাংলাদেশের ফার্মাসিটিক্যাল তারা অনেক গুলো মেডিসিন কিন্তু তারা এক্সপোর্ট করে। তো সেই জায়গাটাতে আমি মনে করি যে আমাদের কাজ করার সময় এসে গেছে এবং পাশাপাশি আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানের গুলো আছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো এক সময় আমরা জানি যে আমরা ভ্যাকসিন আওতার ভেতরে অনেকগুলো ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক যেটা তারা কিন্তু ডেভোলপ হয়েছে। সেই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতেও আমরা কালের বিবর্তনে আসলে এক ধরনের জায়গায় নিয়ে গিয়েছি। সেই জায়গাটা আমি বলছি যে কোভিডের শিক্ষার শুধু এক জায়গা না কোভিডের শিক্ষার জন্য আমাদেরকে অনেকগুলো জায়গায় নিতে হবে এবং নিয়ে আসলে কিন্তু আমাদের এই ভ্যাকসিনের জায়গায় আসতে হবে। আমি মনে করি যে ভ্যাকসিন আসলে সরকার এখন যেভাবে বলছে সরকারের সামর্থের মধ্যে সরকারের ক্যাপাসিটির মধ্যে কিন্তু এই কোভিড এর ভ্যাকসিন তাও আমরা যদি দিতে চাই আমাদের লোকাল প্রোডাকশনে আমাদেরকে রাস্তা খুঁজতে হবে লোকাল প্রোডাকশনে আমরা কিভাবে যেতে পারি? কিভাবে পার্টনারশিপ করে আমরা আসলে তাদের কাছ থেকে নিয়ে আমরা যৌথভাবে এই প্রোডাকশনে যেতে পারি। তাহলে এই সাড়ে ১৬ কোটি মানুষকে বছরে যদি প্রত্যেকবার একবার করে ভ্যাকসিন দিতে হয় এবং এটা পিটিএম অফ দিয়ে আছে। তো সেই জায়গায় যেতে হলে আমাদেরকে দেশের ওপর নির্ভর করে আমরা আসলে অসিনকে নিতে পারবো। আমি বলব যে এখনো পর্যন্ত আমাদের ভ্যাকসিনের যে অবস্থা সে প্রেক্ষাপট আমরা খুব বেশি খারাপ অবস্থায় আছি আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন সেটা আমি বলবো না। এখানে আমাকে অনেকগুলো জিয়ো পলিটিক্যাল ইস্যুজ আছে সেই ইসুগুলো দিয়ে আমরা একেবারে খারাপ অবস্থায় আছি সেটা আমি একেবারে বলবো না।

জিল্লুর রহমানঃ ডক্টর মুশতাক হোসেন।

ডা. মুশতাক হোসেনঃ জি ভ্যাকসিন বিষয়ে ডাক্তার বিললাল খবর দিয়েছেন আমি যেটা মনে করি যে আমাদের যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইউপিআই ভ্যাকসিন দেওয়ার যে সার্ভক্ষমতা প্রতি মাসে অন্তত পক্ষে এক কোটি ভ্যাকসিন দিতে পারবে। এবং ভ্যাকসিন যদি প্রাপ্য হয় হাসপাতালের বাইরে মিডিয়াম পর্যায়ে শুধু না ওয়ার্ড লেভেল এ যারা সবসময় সারাবছর ইউপিআই টিকা দিয়ে থাকে তারা আগে থেকেই প্রশিক্ষিত। তাদের সঙ্গে জনসংক্ষিপ্ততা সেই যে বিষয়টা আগে থেকে আছে তারা জানে কিভাবে জনগণকে সন্তুষ্ট করতে হয়? কারণ আবার প্রতিবছরই বাচ্চাদেরকে টিকা দেয় বাচ্চাদেরকে টিকা দেওয়াটা খুবই সেনসিটিভ বাবা-মাকে যদি আমরা কনভেন্স না করি দাদা-দাদীকে কনভেন্স না করি তারা দেয় না। তো টিকার প্রাপ্যতা যেটা ডাক্তার বিললাল ঠিকই বললো যে ভূ-রাজনৈতিক বলুন বা বাণিজ্যিক বলুন বা উন্নত দেশগুলো তারা তারা নিজেরা উপকৃত হবে আগে, তা কিন্তু তারা কেউই কিন্তু সুরক্ষিত থাকতে পারবে না যদি বিশ্বের বাকি অংশে আপনার ভাইরাসটা ছড়াতে থাকে। কারণ ভাইরাস যতই ছড়াবে সেটা পরিবর্তিত হয়ে নতুন নতুন ভেরিয়েন্ট তৈরি হবে। আজকে দেখা যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে ৯৬ টা দেশে ডেল্টা ভেরিয়েন্ট এর দাপট। এই ডেল্টা ভেরিয়েন্টও কিন্তু আরো নতুন রূপ পরিবর্তন করছে। ডেল্টা প্লাস বা ইত্যাদি ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে আমরা যদি বলি মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়ার যে জনস্বার্থভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ যদি তারা টাকার বিনিময়ে ভ্যাকসিন সিকিউর করছে সিকিউর করতে চাইছে তাদের কে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোকে একজোট হয়ে এটার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আজকে কিছুক্ষণ আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটা সেমিনার করছে ওহেক্স ফ্যাসিলিটির উপরে। কত ভ্যাকসিন প্রয়োজন হবে? তাদের মধ্যে একজন বলেছে উন্নত বিশ্ব তাদের প্রতিরক্ষা খাতে সামরিক খাতে যত ব্যয় করে বছরে তার শতকরা ১ ভাগ টাকা যদি তারা এই ভ্যাকসিন এর জন্য ব্যয় করে এর প্রোডাকশন বানানোর জন্য

ব্যয় করে তাহলে সারা বিশ্বের মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়া সম্ভব। ডাক্তার বিললাল যে কথাগুলো বললো ভ্যাকসিনের তাদের যে কারখানাগুলো আছে সেই কারখানাগুলো সবাইকে কিন্তু কারিকুলাম করতে দিচ্ছে না। কারণ তাহলে তাদের যে তাদের মেঘাসত্য আয় মেঘাসত্য আয় সেমিপ্রসেস প্রডাক্ট যদি ওনারা বিতরণ করে এবং আমাদের মতো বাংলাদেশেও যতটুকু সক্ষমতা আছে এরকম অনেক দেশে আছে যদি তারা একটু শিথিল করে ভ্যাকসিন তৈরি করার জন্য যতগুলো কারখানা সারাবিশ্বে আছে তাদেরকে যদি এলাও করা হয় তাদেরকে যদি সহযোগিতা করা হয় আমি তো মনে করি ১০ থেকে ১৫ গুন কি তার থেকে বেশি ভ্যাকসিন তৈরি করা যাবে যা দিয়ে এই বছরের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ বা মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়া সম্ভব হবে। আর এবছর শতকরা ৪০ ভাগ মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে গোটা বিশ্বের মানুষকে অধিকাংশ মানুষকে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষকে ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে। কাজেই এ বিষয়ে রাজনৈতিক একটা আন্তর্জাতিক রাজনীতি আন্তর্জাতিক অথরিটি এবং জনকল্যাণের জন্য আমি কাজ করছি কিনা। এই ভ্যাকসিনকে মুনাফার যোগ্য দেখলে হবে না। হ্যাঁ যারা ভ্যাকসিন তৈরি করেছে তাদের খরচটা তুলতে হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু এখান থেকে মুনাফা করার চিন্তা করলে কিন্তু আমরা একটা গভীর খাদের দিকে করবো যেই খাত থেকে উন্নত বিশ্বেও রেহায় পাবে না। কারণ এই ভাইরাস যেখানে লাগে এই বিশ্বে ভাইরাসে ভাইরাসের চলাচল একদম ঠেকিয়ে রাখা যায় না এবং উন্নত বিশ্ব ধারা আছে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য কনসালটেন্সি করার জন্য আমাদের মতো দেশে আসতেই হবে এবং যাদের সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থাকবে তারা দেশে ফিরে যাবে অসুস্থ হলে তাদের দেশের তারা যে দেশের নাগরিক তারা যদি চাই দেশে ফেরত যেতে সেই দেশ তাকে বাধা দিতে পারেনা আমরাও পারি না। কাজেই চলাচল হবে মালামাল চলাচল হবে মানুষ চলাচল হবে পৃথিবীর সব দেশকে একযোগে ভ্যাকেশন করা এবং ভ্যাকসিন প্রদানে পরস্পরকে সহায়তা করতে হবে। তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আগামী পৃথিবীর একটা আরও নিরাপদ কেন্দ্রিক গড়তে পারব। ধন্যবাদ।

জিল্লুর রহমানঃ ডা. মুশতাক হোসেন আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে আর কিছু যোগ করতে চান আপনি?

ডা. মুশতাক হোসেনঃ আমি আশা করি বাংলাদেশের যে করনা ভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে সে সংক্রমণ আমরা এটিকে নামিয়ে আনতে পারবো এবং আগামীতে এই ভাবে সর্বাত্মকভাবে সারাদেশ যেন বন্ধ করতে না হয় সেটার শর্ত হচ্ছে একটা খুবই শক্তিশালী লোক নজরদারি ব্যবস্থা করতে হবে এবং দ্রুততা মোকাবেলা করার জন্য আমাদের সেই সব ক্ষমতা আছে আমাদের। সরকারের আইডিইসিআর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এই কাজটা করে থাকে সেই আমাদের এখানে অনেক জনবল দিতে হবে অনেক সম্পদ দিতে হবে লজিস্টিক দিতে হবে তাহলে একটি শক্তিশালী লোক নজরদারি কাঠামো যেটি আছে বিস্তৃত করা যাবে এবং তাকে দ্রুত মোকাবেলা করার কাজ করা যাক তাহলে আমাদের ঘনঘন এভাবে গোটা দেশ বন্ধ করার প্রয়োজন হবে না। স্থানীয়ভাবে আমরা সংক্রমণ নির্মূল করতে পারবো। আশা করি আমরা লকডাউন করতে পারবো আরেকটি চতুর্থ ঢেউ আসার আগেই। ধন্যবাদ।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার বিললাল হোসেন শেষ কিছু বলবেন?

ড. মোহাম্মদ বিললাল হোসেনঃ ধন্যবাদ আমি জাস্ট একটা কথাই বলবো যে জনসম্পৃক্ততার কথা বলছি আমি আমাদের চারপাশে যারা আছে আমরা প্রত্যেকটা আমাদের যারা শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সমাজের আছে আমি তাদের প্রতি আমার একটা উদারতম আহ্বান থাকবে মুশতাক ভাই যেটা বললো যে আমরা এই ঢেউ কিন্তু আসলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিতে পারবো না বারবার এই ধরনের ঢেউ সুতরাং আমরা যাদের চারপাশে সমাজের শিক্ষিত জনগণ তারা যেন অন্তত এই আচরণগত পরিবর্তন ব্যাপারটা নিজেরা মানেন এবং তার চারপাশে তার বাড়ির পাশে তার অফিসের পাশে যারা আছেন তার প্রত্যেক জন যে জায়গাটায় কাজ করেন আমি কেন আমার সামনে দিয়ে কাউকে দেখি না যে সে মাস্ক ছাড়া যাচ্ছে মাস্ক ছাড়া সে বসে গল্প করতে বা অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য সে মাস্ক ছাড়া

বাহিরে যাচ্ছে বা প্রয়োজনীয় কাজেও সে মাস্ক ছাড়া বাইরে যাচ্ছে। মাস্ক গুলো পড়ানোর জন্য আমরা আসলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে কাজ করি এবং আমি মনে করি যে এই জায়গাটা করার জন্য আমাদের সমাজের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আইডল পারসন আছেন তাদেরকে দিয়ে যদি আমরা আপনাদের মতন এই গণমাধ্যমে যদি কিছু বিজ্ঞাপন দেখাতে পারি আমি মনে করি যে সেই জায়গাটাও আমাদের কিন্তু ঘাটতি আছে। কারণ যে সমস্ত রোল মডেলের কথা সমাজের মানুষ শুনে সেই সমস্ত রোল মডেল কে দিয়ে যদি আসলে গণমাধ্যমে বা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়

জিল্লুর রহমানঃ বাংলাদেশে বাংলাদেশ এখন আসলে খুব বেশি রোল মডেল নেই প্রফেসর হোসেন কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না কেউ কাউকে মানে না।

ড. মোহাম্মদ বিললাল হোসেনঃ আমার মনে হয় যে যেটুকু আছে সেটুকু আমরা ব্যবহার করতে পারি। একেবারে যে নাই সেটা আমি বলব না কিন্তু যেটুকু আছে সেটুকু আমরা ব্যবহার করতে পারিনি। পাশের দেশ ইন্ডিয়া সেখানেও যদি আপনি দেখেন সেখানে কিন্তু প্রাইম মিনিস্টার পর্যন্ত মেসেজ দিচ্ছে আমরা কিন্তু সে ধরনের ম্যাসেজগুলো চিন্তা করিনি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে

জিল্লুর রহমানঃ অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বিললাল হোসেন এবং ডা. মুশতাক হোসেন আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় যুক্ত হবার জন্য। দর্শক দেশের কোভিড পরিস্থিতি বা কোরোনা পরিস্থিতি সংক্রমণ পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপের দিকে যাচ্ছে আমার অতিথিরা সেরকমটাই বলছিলেন এবং সে জন্য তারা স্বার্থপর বেঈমান আর জন্য যোগ দিয়েছেন কারণ এটি একটি আচরণগত সমস্যা এবং আচরণগত সমস্যার কারণে এই সংকটটা গভীর থেকে গভীরতম হচ্ছে। এখনো কোন সামাজিক অনুষ্ঠান নয় মাস্কের কোন বিকল্প নেই। মাস্কটা পড়তে হবে এবং সেটা ওয়েল ফিটেড হতে হবে। এটা যথাযথভাবে পড়তে হবে। এবং হাত ধোয়ার অভ্যাসটা এখনই চালু রাখতে হবে। সেজন্য উনারা বারবার বলছিলেন পারস্পরিক দূরত্ব বা শারীরিক দূরত্বটা বাড়িয়ে বজায় রেখে চলতে হবে এবং একথা ওনারা সবাই বলেছেন যে বিপদ হলেও অনেকেই ঝুঁকি নিচ্ছেন কারণ বাস্তবতা এখানে আমাদের জীবিকারও প্রয়োজন জীবন বাঁচানোর পাশাপাশি। কিন্তু সেই প্রশ্নে আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা কঠোর ভাবে কঠোরভাবে লকডাউন ২ সপ্তা ৩ সপ্তা করতে হবে। এরকম ডিলেডালা ভাবে দিনের পর দিন নয় এবং সেই সময়টায় মানুষের সংকর জাতি খাওয়ার সংকট অর্থের সংকট তাদেরকে যদি আমাদের একটি হিসাব আমরা শুনলাম ৬ হাজার কোটি টাকা দরকার প্রতিমাসে। সেই ৬ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশের সামর্থ্য আছে যে সেটি সরকার তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারতো। এর পাশাপাশি উনারা যে কথাগুলো বলেছেন যে এই সংকট মোকাবেলার জন্য আসলে বিশেষ করে জীবিকা সংকট মোকাবেলার জন্য সামাজিক বাংলাদেশি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র নয়। সামাজিক দায়িত্ব অনেকে পালন করতে হবে এখানে বৃত্তবান সমাজে যারা ভালো অবস্থায় আছেন তারা সরকারের পাশাপাশি অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন। সেই সঙ্গে আমাদের স্থানীয় সরকারের বা গ্রামীণ কাঠামোর কথা বলেছেন জনসম্পৃক্ততা খুবই জরুরী। এগুলোকে ব্যবহার করে আমরা করণা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারি যদিও বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আছে নামে মাত্র ঠিকঠাক ভাবে শক্তিশালী কখনোই করা হয় না। বছরের পর বছর ধরে সেগুলো বলা হচ্ছে কিন্তু সেই জায়গা থেকে মনোযোগ দেওয়ার কথা উনারা বলেছেন এবং জনসম্পৃক্ততার কোন বিকল্প নেই সমন্বিত কর্মপদ্ধতির কথা ওনারা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেইসঙ্গে বলছেন যে মেডিকেল চিকিৎসা ও গবেষণায় আরো অর্থ ব্যয় করা দরকার আমাদের রোগ নজরদারির উপরে আরো জোর দেয়া দরকার ছিলো। সেটি দরকার দেওয়া পপুলেশন রেলস্টেশন বা তথ্যভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তার কথা এখানে আলোচনার মধ্যে এসছে পোষা পশু-প্রাণী যে গুলো আছে সেগুলোর পরীক্ষার কথা বলেছেন কারণ তাদের মাধ্যমেও তাদের মধ্যে কোরোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে কোন অসুস্থতায় ভোগে না কিন্তু এটি মিউটেটেড হয়ে আরো অন্য মানুষের জন্য সংক্রমণ তৈরি করে। সেজন্য ওনারা বলছিলেন যে টেস্ট বাড়ানোর উপরে অনেক জোর দেওয়ার কথা বলেছেন টেস্ট পর্যাপ্ত টেস্ট বাংলাদেশ হয় না এবং কী পরিমান আক্রান্ত হচ্ছে কি পরিমান সনাক্ত হচ্ছে সেটি বলতে গিয়ে ৩০ গুণ পর্যন্ত বলা হয়েছে। যে

আমরা দেখি হিসেব বাইরে সেই পর্যায়ে পর্যায়ে যেতে পারে। সে কারনে টেস্ট বাড়ানোর উপরে জোর দিয়েছেন জ্বর কাশি হলে আপাতত করোনার রোগী ফোন কিনবা না হন প্রাথমিক অবস্থায় ধরে নিতে হবে যে তার করো না হয়েছে। সেভাবেই তাকে এক ধরনের আইসোলেশন এর মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। ভ্যাক্সিনেশন এর কোন বিকল্প নেই এবং এই ভ্যাক্সিনেশন বছরে বছরে বাংলাদেশ অর্থ ব্যয় করেও আনতে পারবে না তার মধ্যে রাজনৈতিক প্রশ্ন আছে কূটনীতির প্রশ্ন আছে অর্থনীতি প্রশ্ন আছে। সে কারণে ওনারা মনে করেন যতটা সম্ভব এখন ভ্যাকসিন আনা এবং পাশাপাশি ভাবে বাংলাদেশ যেহেতু ভ্যাকসিন উৎপাদনের সক্ষমতা একটা আছে অনেক কোম্পানির বাংলাদেশ নিজেই জানে ভ্যাকসিন উৎপাদন যদি মনোযোগ দেয় সেই দিকটা উনারা জোর দিয়েছেন। দর্শক নিরাপদে থাকুন এবং ভালো থাকুন ঘরে থাকুন আমাদের আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।